সত্যের প্রকাশ
সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

সাধনা যখন মানুষের মনোজগৎকে আলোকিত করে তখন সে অবাক বিস্ময়ে দেখে তার সামনে এক সীমাহীন বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

সূফী
ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন
পৌষ ১৪২২, ডিসেম্বর ২০১৫, সফর ১৪৩৭

তোমাকে দেখি না আজ চৌদ্দ বছর

যাকে না দেখলে দশ ঘণ্টাকে মতো হতো দশ বছর সেই তুমি আজ চোখের সামনে নেই। এ গোটা সময়টা জুড়ে তোমাকে নিয়ে কতো কাজ করেছি, কিন্তু তুমি নেই, কাকে দেখাবো বলো। কে বলবে, তুমি যা করেছো তা খুব সুন্দর হয়েছে হারু। আমরা তোমার ঝাণ্ডাকে উঁচু করে সারা পৃথিবীতে ঝড়ের বেগে দৌড়াচ্ছি। আজ সারা পৃথিবী জানে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানব সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) মিরপুরের নুরানি পাড়ায় বাইতুর রহিম মসজিদে চিরনিদ্রায় শায়িত। তোমার বাণী আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে। বহু দূরের মানুষ আজ তোমার অনুসারী। তাদের দুঃখ, তারা তোমাকে চর্মচক্ষে দেখতে পায়নি। কিন্তু এরা তোমাকে ভালোবাসে। সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে। আজ বুঝতে পারি ১৯৯২ সালে এক শুক্রবারে তুমি যে কথা বলেছিলে তা কী নিদারুণভাবে সত্য। বলেছিলে, আমার মৃত্যুর পর আমার মুরিদদের অনেকেই ছিটকে পড়বে আমার আদর্শ থেকে। তাই হয়েছে। যারা তোমার পায়ের কাছে বসে থাকতো তারাই সবচেয়ে দূরে চলে গেছে।

তুমি আমার চোখের আড়াল হয়েছো বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ের সবচেয়ে সুন্দর কক্ষটিতে তোমার জন্য আসন পেতে রেখেছি– তুমি আসবে সে প্রতীক্ষায়।

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া, তোমার স্নেহে ধন্য হওয়া– এ আমাদের জীবনে এক পরম পাওয়া। তোমার সংস্পর্শে না এলে কোনোদিনই বুঝতে পারতাম না আল্লাহর মহিমা কী, রাসুলে পাকের (সা.) শান কী, কী তাঁর মর্যাদা আর সত্যিকারের ইসলামই বা কী। তুমি বলেছো রাসুলে পাকের (সা.) অনুসরণ ছাড়া ইসলামে প্রবেশ করার আর কোনো পথ নেই। আর রাসুলে করিম (সা.) বলেছেন তাঁকে অনুসরণ করার চারটি পথ আছে। এ চারটি পথের বাইরে কোনো পথ বেছে নিলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। এ পথগুলো সম্পর্কে রাসুলে পাকের (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছো: 'এর প্রথম পথটি হচ্ছে তাঁর হুকুম (আশ শারিয়াতো আকওয়ালি)। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে তাঁর কর্ম বা কাজ (আত তারিকাতো আফ'য়ালি)। তৃতীয় পথটি হচ্ছে তাঁর হাকিকত বা প্রেমোচ্ছ্বাস (আল হাকিকাতো আহওয়ালি) এবং চতুর্থ পথ হচ্ছে তাঁর মারেফত বা নিগূঢ় তত্ত্ব (আল মারেফাতো আসরারি)। এ চারটি পথ পৃথক পৃথক কিছু নয়– একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সবগুলো মিলে একটি পথ– একটি বৃহৎ পথেরই বিভিন্ন পর্যায় বলতে পারো।' অথচ এমন সুস্পষ্ট পথনির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা আজ দলে দলে বিভক্ত।

أَلَآ إِنَّ
أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ
لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ
وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ

মনে রেখো যারা
আল্লাহর বন্ধু,
তাদের না কোন ভীতি আছে,
না তারা চিন্তান্বিত হবে।

– কুর'আন, ১০:৬২

তোমার প্রস্থানের পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে যে নির্মম পাশবিকতার সূত্রপাত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু যে সহিংসতার শিকার হয়েছে, আজও হচ্ছে, তা আমাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করছে। আজ তোমার উদাত্ত কণ্ঠে মানবিকতা এবং প্রেমের ডাক দেবার বড় প্রয়োজন ছিল। আজ তোমার কণ্ঠে আবার শোনার প্রয়োজন ছিল– 'কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে হচ্ছে এমন একটা কিতাব যে কিতাবে কিছু লেখা নেই। আর সে কিতাবের নাম হচ্ছে প্রেম। অদৃশ্য এ কিতাব পড়াতে পারেন তিনিই যিনি নিজে প্রেমিক। সে জন্যই বলি প্রেম ছাড়া প্রেম হয় না। আর প্রেম ছাড়া প্রেমাস্পদের দেখা পাবারও কোনো উপায় নেই।' তোমাকে চোখে দেখি না, স্পর্শে পাই না বলে আজ আর দুঃখ করি না। কালের যে প্রবাহে তুমি ভেসে চলেছো, আমরাও শিগগিরই সে প্রবাহে নৌকা ভাসাবো। দূরত্ব সামান্যই। আমরাও তোমাতে মিশে যাবো।

আগে চোখের সামনে ছিলে। এখন অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছো। এখন তোমাকে সবকিছুতেই দেখতে পাই। আকাশে তুমি আছো। বাতাসে তুমি আছো। বৃক্ষে বৃক্ষে, পাতায় পাতায়, পাখির গানে, নদীর কলস্রোতে– সব কিছুতেই আছো। জন্মদিনে কী দেবো তোমায় বলো। এই নাও আমি নিজেকেই তোমার হাতে তুলে দিলাম। হে প্রিয় তুমি গ্রহণ করো। □

ইসলাম

মুহাম্মদ আলমগীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন আমাদের সারাক্ষণ আল্লাহর সামনে নত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নত হওয়া নতি স্বীকার করার প্রতীক। বিষয়টিকে হেলাখেলায় নিলে আমাদের ভেতরে বিদ্রোহ জন্ম নিতে পারে এবং আমরা অমান্যকারীতে পরিণত হয়ে যেতে পারি। আমাদের এই পরিণতি যেন না হয়, সেজন্যই নিয়মিত এবাদত। এটাকে সামরিক বাহিনীর সকাল-বিকাল বিরক্তিকর অনুশীলন ও কুচকাওয়াজের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে। এবাদতের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে সদা জাগ্রত থাকি যে আল্লাহই এককভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমরা দায়বদ্ধ। আমরা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে রয়েছি। তিনি আমাদের অনেক অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু পরম ক্ষমতার অধিকারী স্বয়ং তিনি। এবাদতের মাধ্যমে এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে; বারংবার তাঁর প্রতি আনুগত্য নবায়ন করতে হবে।

একই কারণে, অর্থাৎ আনুগত্য দেখাবার জন্য, ধর্মহীন লোকেরা সকাল-বিকাল তাদের পতাকাকে সালাম করে ও গৌরবান্বিত করে। আমরাও আল্লাহর গৌরব উচ্চারণ করি, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমাদের শিক্ষক মহানবী (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে অনেকে একদিকে এবাদতের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, আর অপরদিকে বিনা দ্বিধায় অনেক অন্যায় কাজের সাথে জড়িত থাকে। এটা এক ধরনের মোনাফেকি অর্থাৎ দ্বৈত-আচরণ। ধর্ম ও নৈতিকতার আসল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়ে গেলে, অথবা এগুলোর লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, এটা সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের প্রতিটি আচার-আচরণ একে অন্যের পরিপূরক। ধর্ম একটি harmonious whole বা সমন্বয়িত সমষ্টির নাম। ঠিক যেমন এবাদতের আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিলে নৈতিক নীতিমালা মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনই নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনকে বাদ দিলে আচার-অনুষ্ঠান অসার হয়ে পড়ে। আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পর কেউ যদি মনে করে যে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাহলে সেটা হবে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ধারণা। যাদের ধর্মহীন বলা যায় না, তাদের অনেকে এই ভুলটিই করেন। তারা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন, কিন্তু আল্লাহকে যেভাবে স্মরণ করার কথা, তা করেন না। নামাজের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কুরআন এই সচেতনতার কথাই বলেছে, যেমন: আমাকে মনে রাখার জন্য নামাজ কায়েম করো।

অনেকে মনে করে, আমরা এবাদতের অনুষ্ঠানগুলো হিসাবমতো পালন করছি, অতএব আল্লাহ আমাদের ওপর নিশ্চয় সন্তুষ্ট, আর এটাই যথেষ্ট। এরপর আমরা যা কিছু করি, সেগুলো জীবনের স্বাভাবিক অংশ। বেঁচে থাকার তাগিদে এগুলো না করলে চলে না; এতে দোষের কিছু নেই– যেমন চুরি, মিথ্যা, সম্পত্তি দখল ইত্যাদি। আসলে এ ধরনের চিন্তা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ধর্মের বিকৃতি। এটাকে মেনে নেয়া যায় না। তাই নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদতের পাশাপাশি মানুষের সাথে মানুষের লেনদেন এবং সব রকম আচার-ব্যবহার উচ্চমাত্রার নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

আমরা জানি মানুষের স্বভাব পারদের মতো; সে স্থির থাকতে পারে না। সে এই মুহূর্তে একটা চায়, পর মুহূর্তে আরেকটা চায়। সে তার সঙ্কল্প ভুলে যায়। সে পার্থিব সুবিধা অর্জনে আর লাভ-ক্ষতির হিসাবে বিভোর থাকে। এসব দুর্বলতার কারণেই তাকে সারাক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। অতএব যাদের ধর্মীয় জীবনে ভালো ও মন্দের মিশ্রণ রয়েছে, তাদের উচিত ধর্মের সঠিক ধারণা অর্জন করা। এবাদতের অনুষ্ঠান হোক আর নৈতিক মূল্যবোধ হোক, দুই ক্ষেত্রেই আমাদের অনেক সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই চায় না যে তাকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ কী, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হোক! সে মনে করে সে যে কাজ করছে, তার পেছনে যে সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে, তা এই সব সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা বুঝবে না– আল্লাহর সাথে তার বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

আবারো বলতে হয়, নৈতিক শুদ্ধতা আর ভক্তিপূর্ণ এবাদত, এই দুটি আল্লাহরই নির্দেশ। এই আচরণমালা দুটি তাঁরই ইচ্ছা, অন্য কারো ইচ্ছা নয়। তিনি একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা পালন করতে বলেননি। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাও বলেননি। তাই একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, একটাকে বাদ দিলে অন্যটার কোনো অস্তিত্বই থাকে না, অর্থাৎ অন্যটাকে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তি বাকি থাকে না। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকানদের দাবি যে তারা মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, আসলে সত্য নয়। আসলে তারা ব্যক্তিস্তরে, সমষ্টিস্তরে, জাতিস্তরে, আন্তর্জাতিকস্তরে, মোটকথা জীবনের সর্বস্তরে যেটা পালন করে সেটাকে বলা হয় Pragmatism বা সুবিধাবাদ। অর্থাৎ, যদি সত্য কথা বললে সুবিধা হবে তাহলে তারা সত্য কথা বলবে, আর যদি মিথ্যা কথা বললে সুবিধা হবে তাহলে তারা মিথ্যা কথা বলবে, ইত্যাদি। তারা যে শুধু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়েছে তাই নয়, একটু খুঁটিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা নৈতিকতাকেই মানে না।

ধর্মকে বাদ দিলে এই প্রশ্নই থেকে যায়– নৈতিকতা কেন? তারা বলে, এটা তো মানুষের সৃষ্টি। এগুলো সেকেলে মূল্যবোধ। এগুলোর পরিবর্তন হওয়া উচিত। ফলে, তারা পশুদের মূল্যবোধকে আপন করে নিয়েছে। তারা পশুদের পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের জীবনে এখন জঙ্গলের আইন চলছে। এর উপমা হলো গাছের শিকড়গুলো যদি উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে স্বাভাবিক পুষ্টি না পেয়ে গাছটি আস্তে আস্তে মরে যাবে, এটা কেবল সময়ের ব্যাপার। আমাদের নৈতিক জীবনের শিকড় কোথায়? প্রাথমিক শিকড় হলো পরিবারের শিক্ষা, তারপর সমাজের রীতিনীতি, তারপর প্রচলিত মূল্যবোধ। এগুলোর পেছনে প্রধান শিকড় হলো ধর্মীয় অনুশাসন যা পুরুষানুক্রমে পিতামাতা থেকে সন্তানের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই শিকড়গুলোর যে কোনোটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সমাজের নৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

গবেষকরা বলছেন যে আজ সাধারণভাবে মানব জীবনে এবং বিশেষভাবে ইউরোপীয় জীবনে যে নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, সেটা মোটামুটিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শুরু হয়েছিল। তখন তাদের বুদ্ধিজীবীরা বলতে শুরু করলেন যে দেশপ্রেমের কোনো মূল্য নেই, এটা উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে একটা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়ার পর তাদের এই চিন্তাধারা অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতেরা অক্লান্তভাবে সকল নৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে চলেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতা এক মহাপ্লাবনে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। রয়ে যাচ্ছে শুধু ডেকার্ট (Descartes), কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel), হিউম (Hume), নীত্শে (Nietzsche) প্রমুখদের দর্শন। আর এগুলোর পরোয়াই বা কে করে? কারণ এদের একে অন্যের কথার মধ্যে কোনো মিল নেই। এগুলোর মূল্য fossil বা জীবাশ্মের চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক দার্শনিক তার পূর্বসূরির দর্শনকে নাকচ করে দেন। আজ যারা দর্শনে নোবেল প্রাইজ তুলে নিচ্ছেন, কাল তাদের নামটাও কেউ উচ্চারণ করবে না। (চলবে)

মুহাম্মদ আলমগীর: ১৯৪২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি করাচিতে শিক্ষা জীবন এবং প্রাথমিক কর্মজীবন কাটান। ষাটের দশকে তিনি মরহুম মওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রহ.) এবং মরহুম ড. বুরহান আহমদ ফারুকী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করেন। এই লেখাটি তাঁর **কুর'আন সম্মত মুসলিম জীবন** গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

অ দ র্শ নে অ ধ র্ম

নিশাত বদরুল

তখন যৌবনের উচ্ছলতা আর উদ্দামতার দুর্দমনীয় উপস্থিতি গোটা শরীর ও মানসে। ধর্মবোধ তিরোহিত বস্তুবাদের কবলে পড়ে। বাম সংগঠনের সার্বক্ষণিক ছিলাম। তবে মানবকল্যাণই ছিল একমাত্র মোক্ষ। সমাজ পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেহের কোষগুলোতেও স্থায়ী আসন গেড়ে আছে। ১৯৯৪-এর এমনি এক অলস দুপুরে গ্রাম্য হাটের এক চা দোকানির সাথে গল্প করছি। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক– মতিন ভাই। হাতে সেদিনের বাংলাবাজার পত্রিকা। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আমাকে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন 'সংলাপ'-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেখানে প্রফেসর হারুন-উর রশিদের নাম দেখে চমকিত হলাম। কেননা একসময় পত্রপত্রিকার পাতায় গল্প লিখে কিছুটা খ্যাতি পেয়েছিলাম। সে সময় আমার জ্ঞানীগুরু প্রফেসর হারুন-উর-রশিদের 'শব্দের শিল্পরূপ' এবং 'তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ' গ্রন্থ দুটি আমাকে বিমোহিত করেছিল। আমার এক কবিবন্ধু তো অনেকগুলো কবিতাই লিখে ফেলেছিল গ্রন্থ দুটির দোলায়িত ব্যঞ্জনায় আর শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহারে। 'সংলাপ'-এর সেদিনের কথোপকথন আমাকে এতোটা বিস্ময়াভিভূত করেছিল... বিষয়টি ছিল 'কালেমা'। আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল এক লহমায়। আমি অনেকটা সময় ছিলাম বাকহীন। মতিন ভাইয়েরও ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সেদিন তাকে মনে হয়েছিল একটা পাথরের মূর্তি। আমরা দুজন কেবল চোখে চোখ রেখে ভেতরের আলোড়ন অনুভব করছিলাম। কী এক নব-চিন্তন জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড গতি নিয়ে এতোদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা বিশ্বাসের দুষ্প্রবেশ্য আঙিনা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। মনে মনে সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির একটা ভাবমূর্তি সংবলিত ছবি নিজেই এঁকে ফেলেছিলাম হৃদয়ের গভীর গোপন কুঠরিতে। মেঠোপথে ঘরে ফেরার সময় সেদিন মনে হচ্ছিল– সজীব বস্তু (চিন্তন-সম্পন্ন) ও নির্জীব বস্তুর বিকাশের শর্ত এক হতে পারে না।

এরপর নিয়মিত বাংলাবাজার পড়ছি। সংগঠন ত্যাগের পর থেকেই তাদের রোষানলে পড়ে কেবলি এদিক-সেদিক করে বেড়াচ্ছি। মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা– কবে দেখা পাবো হুজুরের। এসময় বাইতুর রহিম জামে মসজিদের সাবেক সেক্রেটারি হাই সাহেবের এক ড্রাইভার শফিক আমাকে একদিন ৬১ মতিঝিলে নিয়ে গেলো। সে ছিল হাই সাহেবের এক ভাগ্নি আসমার স্বামীর (হারুন) ফার্মের ড্রাইভার। কাকতালীয়ভাবে সেই ফার্মের ম্যানেজার তখন আমি। তখনো জানতাম না শফিক কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দরজায় ঢোকার মুহূর্তে নেমপ্লেটে চোখ পড়তেই আমার গোটা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। একি! যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমি তরী ভাসিয়েছি, সেই হালছাড়া তরী আপনাতেই এসে ভিড়ে গেলো প্রেমের চরায়। ভেতরে ঢুকে কদমবুছি করে দাঁড়াতেই তিনি বসতে বললেন। সামনে বসে মনে হলো এমন সুদর্শন, শান্তদৃষ্টি ও প্রকৃতির যে ভাবমূর্তি তাঁর এঁকেছিলাম মনে মনে– এ যেন অবিকল সেই প্রতিমূর্তি। আমাকে তিনি শুক্রবারগুলোতে মসজিদে আসার আহ্বান জানালেন। জীবনাচরণের কিছু বিষয় তুলে ধরলেন। আংটির জন্য কাগজে ছক এঁকে ও লিখে দিলেন। সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন– 'আমি মসজিদের কাজ অফিসে করি না আর অফিসের কাজ মসজিদে করি না।' আংটি নিয়ে যেন মসজিদে যাই। আমি তখনো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বাক্যশ্রবণ ও সৌম্য জ্যোতির্ময় মুখশ্রী দর্শনে ধ্যানমগ্ন। তাঁর দর্শনে আমার ভেতর ধর্মবোধ জাগ্রত হলো। ভেতরের সমস্ত 'কু' যেন পিষ্ট হয়ে সু-চিন্তায় আবিষ্ট। আমি অনুভব করলাম– আমার ভেতর অন্য কেউ জেগে উঠেছে। যাঁকে আমি কোথায় যেন দেখেছি অথচ তাঁর নাগাল পাইনি। আজ মুহূর্তের ঝাপটায় সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেলো। প্রশান্তির ছায়া আমাকে করলো শীতল। এক মহাশক্তি আমাকে ঘিরে ধরে নতুন এক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে সঞ্চিত বিশ্বাসের জমাট অন্ধকার দূর করে দিলো। আমার ধ্যান ভাঙলো চা পানের জন্য শফিকের ডাকে। হুজুরের ঠোঁটের কোণে তখন মধুমাখা হাসি। সেদিন নতুন এক 'আমি' ফিরে আসি জৌনপুরি-বৃত্তের সুরভিত গুলিস্তাঁ থেকে।

এরপর দীর্ঘদিন তাঁর আলোকিত বলয়ে থেকে ধর্মের বিলুপ্তপ্রায় বিষয় নতুন করে জেনেছি। তিনি বলেছেন, পরকালে শান্তির জন্য চাই সাধনা। সাধনা ছাড়া জীবন পশুর সমান। এজন্য তিনি কায়কর্মশুদ্ধি, বাককর্মশুদ্ধি ও মনঃকর্মশুদ্ধি বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। মনে মনে যে জেনা হয়– এটা আমি প্রথম তাঁর তাকরির থেকেই জেনেছি। জেনেছি বিকারমুক্ত চিত্তেই অনাবিল সুখ ও শান্তি। একসময় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং মুখশ্রী দর্শনে আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমার মতো নাস্তিক ও বহু পাপিষ্ঠের। এগুলো এখন কেবলি স্মৃতি। ২০০১ সালে তাঁর আড়াল হয়ে যাওয়ার পর অনেকের অনেক সুন্দর অভ্যাস অনভ্যাসে পরিণত হতে দেখলাম। লক্ষ করি, পরিচিত জনের অনেকের আচার-ব্যবহারে ধর্মবোধ তিরোহিত আর নিভৃতে কাঁদে তাঁর বাণী-মাধুর্য। তিনি বলেছিলেন, আমাদের পাপ করার চেয়ে স্রষ্টার ক্ষমা করার শক্তি অনেক বেশি। তাই একমাত্র চাওয়া– হুজুর জৌনপুরির ক্ষমাসুন্দর বৃত্তে যেন ঠাঁই হয় আমাদের। আজ জন্মদিনে তাঁর লেখা সেই কবিতাটি মনে পড়ছে– দীপ জ্বেলে যাই সবার আধারে/নিজের ছায়ায় রহি কাঁদিবারে/হয়তো বা আমি বেঁচে রব শুধু/ছিঁড়ে ফেলা কাহিনীতে।

কিন্তু আমাদের শপথ: আপনার মিশনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো আপনারই ইচ্ছায়। আমিন। □

আত্মার গহীনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন
নিশ্চিতভাবেই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।

দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর সেবায় নিয়োজিত থেকে এবং অগণিত মানুষকে হাকিকতের পথে জাগ্রত করে বিগত ১১ নভেম্বর ২০১৫ সালে আমেরিকার সময় দুপুর আড়াইটায় শেখ সিদি মুহাম্মদ আল জামাল (রহ) স্রষ্টার কাছে ফিরে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সিদি জামাল ১৯৩৫ সালে পবিত্রভূমি প্যালেস্টাইনের তুলকামে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মসজিদ আল-আকসার একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সালে প্রথম আমেরিকাতে আসেন এবং তারপর থেকে প্রতি বছরই আমেরিকাতে আমন্ত্রিত হয়ে আসতে থাকেন এবং তাঁর হাতে বায়াত দেন বিপুল সংখ্যক মানুষকে যারা তরিকতের সুঘ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পালন করছেন। তিনি শেখ আবদুর রহমান আবু আর রিসাহ (রহ)-এর কাছ থেকে খেলাফত পেয়ে সাজিলিয়া তরিকতের শেখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি তাঁর এক বই 'পাথ টু আল্লাহ'-তে লিখে গেছেন: "(আল্লাহকে প্রেম নিবেদন করা) মানুষের জন্য মৃত্যু জীবনের চাইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অনেকগুণ বেশি খুশির কারণ। তাঁরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব বিক্রি করতে প্রস্তুত। এঁরা জানেন যতক্ষণ তাঁরা মৃত্যুবরণ না করেন ততক্ষণ তারা সত্যিকারের জীবনে প্রবেশ করবেন না। যারা সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করে তারা নয়, বরং যাঁরা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই সত্যিকারের মৃত্যু পেয়েছে। 'হে আল্লাহ আমি চিরকাল ও বারবার তোমার পথে মৃত্যুবরণ করতে চাই (ফানা) যেন আমি তোমার সাথে চিরজীবন বেঁচে থাকতে পারি, যেন আমি তোমার মহাপবিত্র সত্তার অসীম সাহচর্য লাভ করি, যেন তোমার রহস্যময় অস্তিত্বের (বাকা) যে পুরস্কার তুমি তোমার প্রিয়জনকে দিয়ে থাকো তা যেন লাভ করি। তাঁরা সকল সময় পরম আনন্দের জগতে বাস করেন। তাঁরা তোমার সাথে সংযুক্ত সবসময়। ও আমার প্রিয়তম, আমার জীবন অস্তিত্ব এবং আমার রুহ আমি তোমার রাহে কুরবানি করছি। তোমার মাঝে মৃত্যুবরণ সহজ, কেননা এতো তোমারই জন্য।'"

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

গুপ্ত রহস্য (সির্‌ / sirr): সির্‌ হলো মহাপ্রভুর এক অতি সূক্ষ্ম (লাতিফ) বৈশিষ্ট্য এবং যখন এটি এক ধাপ নেমে আসে তখন তা 'রুহ বা আত্মা' (spirit) নামে এবং আরো এক ধাপ নাজিলে এটি 'অন্তর' বা 'আধ্যাত্মিক হৃদয়' (heart) নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকাশিত জগতে যার নামকরণ করা যায়- নফস, আত্মা, অন্তর ও গুপ্ত রহস্য বা সির্‌। নামের বহুত্ব মানে এই নয় যে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে তিনি বহু, বরং এটি একটি অস্তিত্বের বিবিধ নাম। এর ব্যাখ্যা হলো যে পরম পবিত্র এবং প্রশংসিত আল্লাহ রুহকে তাঁর অদেখা ভুবনের বাছাই করা নুর থেকে তৈরি করেছেন এবং তাকে সযত্নে সংরক্ষিত করেছেন যেন এটি পরিপূর্ণভাবে স্রষ্টার পরিচয়ে পরিচিত থাকতে পারে। এর ফলে মানুষের রুহ এর আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় আল্লাহর প্রেম ও একত্ববাদে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির পরিচয় জেনে থাকে। এটি সম্পূর্ণ কলুষতামুক্ত অবস্থায় সেভাবেই থাকে যা আমাদের ধারণারও বাইরে। মহিমান্বিত আল্লাহ এই আত্মাকে এর পরে মানুষের দেহে স্থাপন করে থাকেন এবং এর স্থিতির ফলেই শরীর তার নড়াচড়া যেমন করতে পারে তেমনি চৈতন্য বা চেতনা লাভ করে।

যখন আত্মা শরীরে স্থিতিলাভ করে তখন এটিকে বলা হয় নফস। নফস অনেকটা সূক্ষ্ম ধোঁয়ার (subtle vapour) মতো যা জীবনীশক্তি, নড়াচড়ার শক্তি এবং চেতনা বহন করে। সুতরাং নফসের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে কিন্তু আলাদাভাবে নফসের নিজস্ব সত্তা নেই কেননা এটি রুহ বা জান এবং শরীরের একীভূত অবস্থায় অস্তিত্ব পেয়ে থাকে, যখন শরীর থেকে জান আলাদা হয়ে যায় তখন নফস তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। যতক্ষণ নফস বান্দাকে পরিচালিত করে থাকে ততক্ষণ এটি নিন্দার অধিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের আধার।

অন্যভাবে প্রকাশ করলে বলা যায়, রুহ বা জান নফসের হাতে বন্দি। স্বার্থপর নফসের মূল কাজ হলো নিজের চাহিদা ও ক্ষুধা পরিতুষ্ট করা। কিন্তু এর ফলে সে স্রষ্টার উপস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলে এবং রুহের উজ্জ্বলতা থেকে বঞ্চিত হয়। নিন্দাজনক বৈশিষ্ট্য এবং নিম্নগামী প্রবণতার মধ্য দিয়ে নফস রুহের ওপরে জয়ী হয় ও ব্যক্তিকে দুর্নীতিগ্রস্ত (ফাসিক) করে তোলে এবং স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ থেকে সে দূরে সরে যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ বিমুখী হয় এবং নিজের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির দাসত্ব করে ততক্ষণ তাকে 'আজ্ঞাকারী নফস' বা আন-নফস আল-আম্মারাহ নামে ডাকা হয়, কেননা এটি মন্দের দিকে আদেশদানকারী। যখন স্রষ্টার নূর নফসের ওপরে প্রবাহিত হয় তখন নফস নিজের কার্যক্রমের জন্য নিজেকে দোষারোপ করে এবং অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে আরম্ভ করে। এর ফলে নফস থেকে নিন্দাকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ দূরে সরতে থাকে। এ অবস্থায় নফসকে বলা হয় 'অনুশোচনাকারী নফস' বা আন-নাফস আল-লাওয়ামাহ।

স্রষ্টার নূর নফসের ওপরে প্রবাহিত হলে তারা দাবি করে নফসের বড় ধরনের অবাধ্যতা বা পাপকার্য থেকে তাকে বিরত রাখতে, কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবাধ্যতা তখনো বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় ধীরে ধীরে এটি স্রষ্টার পবিত্রানুভূতি লাভ এবং স্রষ্টার উপস্থিতি উপভোগ করতে শুরু করে এবং হৃদয় নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। এর ফলে নফস আন্দোলিত হয় এবং তার প্রকৃত যে অসীম জগৎ তার প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হতে আরম্ভ করে। কখনো কখনো নফসের যে পুরু দৈহিক ও জৈবিক জগতের পর্দা তা হৃদয়কে অসীম জগৎ থেকে আলাদা করে এবং হৃদয়কে নফস কব্জা করে বসে। এ কারণেই হৃদয়কে আরবি ভাষায় 'কলব' বলে যা 'কালাবা' শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ যা ঘন ঘন ঘুরে বা অবস্থান পরিবর্তন করে। ঠিক একই ভাবে আধ্যাত্মিক হৃদয়ও ঘূর্ণায়মান বা তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। অনুবাদ: সাদিক মো. আলম (চলবে)

■ প্রধান সম্পাদক : প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ নির্বাহী সম্পাদক : নিশাত বদরুল ■ অঙ্গসজ্জা : মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।